ভিন্ন ভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বুদ্ধিমান মানুষের কার্যধারা ও [illegible] কার্যপ্রণালী – এ দুয়ের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জের মধ্যে রয়েছে মেঘ, নদী, সাগর, পর্বত, অরণ্য, ইত্যাদি। এ সবের সম্মুখীন হলে মানবমনে চিন্তার জাল রচিত হয়। এই প্রকৃতিজাত চিন্তাই তার আচরণের নিয়ন্ত্রক, তার সংস্কৃতির জন্মদাতা, তার পোষাক ও গৃহনির্মাণ পদ্ধতির উদ্ভাবক।

কিন্তু দেহ ও মনের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। যে চিন্তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা তা সামগ্রিক সমাজের চিন্তা নাও হতে পারে। কর্মপ্রেরণা আসে চিন্তার মধ্য দিয়ে। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলেই প্রতিটি সামাজিক মানুষের চিন্তা ধারার মধ্যে কমবেশী ঐক্য রয়েছে। এই stream না থাকলে সামাজিক কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি হত না – সম্ভব হত না লোককৃতির (Folk-lore) জন্মলাভ।

প্রকৃতিকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে আমরা তার মূল্য মান সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। এ প্রচেষ্টা আজকের নয়। ম্যাসিডনের অধিপতি ফিলিপ-এর রাজত্বকালেও (খ্রী: পূ: ৩৫০অব্দ) দেখা যায়, এরিস্টটল তাঁর ' লিসায় ' বিদ্যাভবনের জন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করতেন পশুশিকারী ও মৎস্যশিকারীদের কাছ থেকে। মানুষের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের এই ত্রিশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয় লোক-সংস্কৃতি।

কিন্তু লোকসংস্কৃতির ধর্ম বহতা নদীর স্রোতের মত। এ স্থিতিশীল নয় — গতিশীল। এর রূপ বদলায় যুগে যুগে, কালে কালে। পশ্চিমবাংলায় উত্তরপূর্বাঞ্চলের বর্তমান সংস্কৃতির প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, এ সংস্কৃতির রূপ আগের তুলনায় অনেক বদলেছে। পরিবেশগত কারণ এর মধ্যে প্রধান, কিন্তু একমাত্র নয়।

মানুষের নব নব উন্মেষচেতনা ও তৎপ্রসূত বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির মত পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে ও পরিবর্তন এনেছে। চিন্তার রূপাতিক্রম যত দ্রুত, লোককৃতির পরিবর্তনের স্রোতধারাও সেখানে তত প্রবল। এই পরিবর্তন এক দিনে ঘটে না – ঘটে ধীরে ধীরে। নতুন নতুন আবিষ্কার হয়, নতুন মাটি ও নতুন দেশের জন্মলাভ হয়। কিন্তু ব্যক্তি-পরিবার ও জাতির সমন্বিত রূপ সহসা বদলাতে চায় না। ' নিতুই নব '-র মাঝখানে রয়ে যায় আদিকালের লোকবিশ্বাস, উৎসবানুষ্ঠান, বাদ্যযন্ত্র, লোকশিল্প, সাজপোষাক ও অলংকার, আহার ও আহার্যদ্রব্য প্রস্তুতের মধ্যে।

আবার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ইতিহাসের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ক একান্তভাবেই মৌলিক। তাই পশ্চিম বাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের

লোকসংস্কৃতির আলোচনায় এই বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক বিশিষ্টতার কথা উল্লেখ করতে হয় ।

যেমন ভাবে সাগর , নদী , পাহাড় , পর্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপকরণের দ্বারা যেমন একটি দেশের প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক সীমানা চিহ্নিত করা যায় , ঠিক্ তেমনি ভাবে সংস্কৃতির কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না । কারণ 'চরৈবেতি' সংস্কৃতির মূলমন্ত্র । কিন্তু সংস্কৃতির ধর্ম যদিও চলিষ্ণু – এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে , এক দেশ থেকে আর এক দেশে গমন , তবুও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের কতগুলি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে । বৈশিষ্ট্যের এই তারতম্যের জন্য একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্বতন্ত্র পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার , গৃহনির্মাণের পার্থক্য , ভাষা ও বিশ্বাসের ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় । লোকচর্যার পার্থক্যের ফলেই সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করে । কিন্তু তার ফলে সংস্কৃতি তার মৌলিকতা হারায় না । এই কথাটি মনে রেখে আমরা পশ্চিম-বাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতির আলোচনায় প্রবেশ করব ।

বর্তমানে পশ্চিম বাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চল বলতে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলকে বোঝায়। কিন্তু আমরা আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিমাংশকে এতদঞ্চলের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতি। আবার বিভক্ত বাংলার রংপুর জেলাও আলোচ্য সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র নয় কাজেই [redacted] মূলত: পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি হলেও প্রসঙ্গক্রমে রংপুর ও গোয়ালপাড়ার কথা উল্লেখ করতে হবে । এর ফলে এতদঞ্চলের সংস্কৃতির ব্যাপকতা ও প্রসারতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ হবে বলে মনে হয় । আসামের গোয়ালপাড়া ও পূর্ববাংলার রংপুরকে বাদ দিলে ও আলোচ্য সংস্কৃতির এক বিরাট অংশ যখন পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের মধ্যে পড়ে , তখন এই সংস্কৃতির নাম দেওয়া যায় 'পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতি' ।

আধুনিক কালের মানচিত্রে (ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরে) পশ্চিম-বাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চল বলতে যে অংশটিকে বোঝানো হয় , তার পরিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে। এই পরিবর্তনের ধারাটিকে সঠিক ভাবে নিরূপণ করা আজ আর সহজ নয় । তবুও আমরা পুরাণ , রামায়ণ , মহাভারত, যোগিণীতন্ত্র , তন্ত্রসার গ্রন্থ , বিদেশী পর্যটকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতিকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে [redacted] উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করব । এ ছাড়া প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহু ছড়া, এবং কিংবদন্তি , লোকসঙ্গীত , কাহিনী, সাধুকথা , প্রবাদ প্রভৃতির পর্যালোচনা এবং অসংখ্য পুরাকীর্তি, ভগ্ন ও অভগ্ন দেবদেউল , প্রাচীন পুষ্করিণী প্রভৃতিকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে এতদঞ্চলের সংস্কৃতির প্রাচীন ও বর্তমান রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করব ।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনের পরিবর্তন ও অবশ্যম্ভাবী। আবার সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এরই সঙ্গে রয়েছে প্রকৃতি-পরিবর্তনের যোগ। পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য এ পরিবর্তন একদিনে ঘটে নি, ঘটেছে যুগ যুগ ধরে।

ভৌগোলিক পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান হল নদীর স্রোতোধারার পরিবর্তন। পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলকে নদীবহুল অঞ্চল বলা যায়। অসংখ্য প্রধান এবং অপ্রধান নদীগুলির সদয় ও নির্দয় প্রভাবে এতদঞ্চলের জনসমাজশতাব্দীর পর শতাব্দী উপকৃত ও নিপীড়িত হয়েছে। পাহাড়িয়া নদীগুলির বর্ষাকালীন স্ফীতি ও তজ্জনিত বন্যায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার এবং দোয়ালপাড়া জেলার মানুষ বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৫০, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬৮ সালের কীর্তিনাশা বন্যার প্রধান কারণ গলিত, তুষারপুষ্ট এবং বর্ষাস্ফীত তিস্তা তোরসা, জলঢাকা, রায়ডাক, কালজানি, গদাধর, সঙ্কোষ, করতোয়া প্রভৃতি নদীর প্রচণ্ড গতিবেগ। সারা বছর এদের চেহারা একরকম থাকে না। যে নদী বর্ষাকালে প্রচুর জলধারা বহন করে নিয়ে আসে, শীতকালে সেই নদীই আবার শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। পর্বতশ্রেণী থেকে এদের জন্ম; তাই এগুলি পার্বত্য নদী এবং এই কারণেই এদের গতিবেগ প্রচণ্ড। অবশ্য প্রাথমিক গতির প্রচণ্ডতা মধ্য গতিতে থাকে না। জলস্রোতের সঙ্গে এই সব পাহাড়িয়া নদী মূল্যবান পলি বহন করে নিয়ে আসে। এ ছাড়া নানা ধরণের পাহাড়িয়া গাছ ও বিভিন্ন আকৃতির পাথরও জলস্রোতের সঙ্গে সমতল ভূমিতে অবতরণ করে।

এতদঞ্চলের কয়েকটি বিশেষ নদ-নদী সম্বন্ধে সুকুমার সিংহের মতের সঙ্গে আমরা একমত। "বন্যায় বৃত্তসর্বস্ব বহু মানুষের রিক্ততা ও বেদনার করুণ কাহিনী কয়েকটি নদনদী রচনা করেছে সত্যি। কিন্তু কেবল দুঃখ ও ব্যথার অশ্রুপথে প্রবাহিত হয়েছে বলা যথার্থ নয় বেশ কিছু নদীর বুকে অনেক শোকাহত মানুষ পুণ্য দিনে স্নান শেষে করুণা ধারার সন্ধান পেয়েছেন। অনেক মানুষের পাপবোধের গ্লানি এবং জ্বালা অবগাহনের মধ্যে ধুয়ে মুছে গিয়েছে এবং শুচিস্নাত আরও অনেকে নদীকূলে উৎসবের আনন্দে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা ভুলে প্রাণের দেবতার অমূর্ত রূপের সন্ধান করে চলেছেন। অমৃতলোকের আনন্দধারায় শান্ত নদীর প্রবাহে তার রোমাঞ্চিত রূপ কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। প্রসন্না তিস্তা ক্ষমতার আশীর্বাদ পূতা ত্রিস্রোতার নির্মল ধারা হিমালয়ের বুকে মহাদেবের পিঙ্গল জটাজুট ছেড়ে সুরলোকের পবিত্রতায় সমতল ভূমির মানুষকে শাশ্বত সঞ্জীবনী মন্ত্র শোনাতে ছুটে চলেছে' আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। .... কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।' ১

পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের অসংখ্য নদনদীর মধ্যে কয়েকটি হল তিস্তা, মহানন্দা, রায়ডাক, তোর্সা, করতোয়া, মেচি, ডাহুক, সাহু, তালমা ধরলা, কালজানি, করলা, সঙ্কোশ, চাওয়াই, পাঙ্গা, গদাধর, জলঢাকা, জটোদা ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল তিস্তা। শুধুমাত্র আকৃতিতেই বিশাল নয়, প্রয়োজনের দিক দিয়েও এর মূল্য অপরিসীম। দার্জিলিং জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই নদী জলপাইগুড়ি ও পূর্ববাংলার রংপুর জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। Major Rannel -এর Atlas of 1770 তে তিস্তা নদীর প্রাচীন গতিপথের উল্লেখরয়েছে। এছাড়া Memoir of a map of Hindusthan (Page at 352) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন — " The Tista is a large river which runs almost parralel to the Ganges for nearly a hundred and fifty miles. During the dry season, the waters of the Tista run into those of the Ganges by two district channels situated about 20 miles from each other and a third channel at the same time discharges itself into the Meghna. The current is always strongest on the external side of the curve formed by the serpentine course of the river."[2]

বর্ষাস্ফীতা তিস্তা নদীর স্রোতোবেগ প্রচন্ড। তাই এর আর এক নাম ডাডই। 'ডাডই' শব্দটি রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। এর অর্থ 'গর্জনশীল'। বর্ষাস্ফীতা তিস্তা নদীর স্রোতোবেগ অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় এই নদীর আর এক নাম গর্জনকারী তিস্তা বা ডাডই। এর সঙ্গে এসে মিলিত হয় তোর্সা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক প্রভৃতি পার্বত্য নদীর গর্জন।

প্রচন্ড শক্তিসম্পন্না বলেই তিস্তা ভয়ংকরী। তাই তিনি লোকমানসে দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিতা। এতদঞ্চলের প্রত্যেকেই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বৈশাখমাসের যে কোনো দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে 'সেবা' দিয়ে থাকেন। তিস্তাবুড়ির রোষবহ্নি থেকে রক্ষা পেলে সাধারণ মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করতে পারবে, ফসল ভাল হবে, রোগ ও মহামারীর হাত থেকে পুত্র পরিজন রক্ষা পাবে।

আলোচ্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীতে অসংখ্য নদনদীর নাম পাওয়া যায়। গ্রাম্য গীতিকার ও কবিয়ালদের কল্পনার সঙ্গে নদনদীর বাস্তব রূপবর্ণনার সংমিশ্রণঘটায় ভাওয়াইয়ার মত অমর প্রেমসঙ্গীতের জন্ম এতদঞ্চলেই সম্ভবপর হয়েছে। লোকমানকেও নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে এই সব নদী ও তৎপুষ্ট সমভূমি। তাই এদের কথা বাদ দিলে পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতির আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চল, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্রই একরকম নয়। সমগ্র দার্জিলিং জেলায় এবং জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিক। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশে বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ১৭৫"থেকে ২০০"। আবার দক্ষিণ অংশে বর্ষাকালীন বারিপাত গড়ে ১০০"।

কৃষিকর্ম এতদঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। কৃষিকাজের জন্য বৃষ্টির উপরেই কৃষকদের নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বারিপাত সর্বত্রই সমান নয় বলেই কোথাও কোথাও জমিতে পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায় আবার কোথাও কোথাও জলের ঘাটতি দেখা দেয়।

পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের জলবায়ু চা-চাষের পক্ষে উপযোগী। একথা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম উপলব্ধি করেন ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর ফলেই অধুনা ডুয়ার্স অঞ্চলে এবং কুচবিহার জেলায় চা-বাগিচার সূত্রপাত ঘটে ১৮৫২ থেকে ১৮৭৪-এর মধ্যে। আলোচ্য অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ধারায় চা বাগিচা প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। চা-বৃক্ষ রোপণের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলাকীর্ণ স্থান গুলি পরিষ্কৃত হতে থাকে এবং বহু সংখ্যক চা-শ্রমিকের আগমন ঘটতে থাকে ডুয়ার্স অঞ্চলে। শ্রমিক আমদানীর পিছনে একটি প্রধান কারণ রয়েছে। সুদূর অতীতে সামাজিক জীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের অধিবাসী অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ জীবনে অভ্যস্থ। কৃষিভিত্তিক জীবনকেই এরা প্রথমাবধি বরণ করে নিয়েছে। তাই চা-বাগিচা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকবৃত্তি গ্রহণ করতে এরা রাজী হয়নি। এরই অনিবার্য ফল হিসেবে তৎকালীন ভারতীয় ও বৃটিশ চা-কোম্পানীগুলি বিহার, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ এবং নেপাল থেকে প্রচুর চা-শ্রমিক আমদানী করে। পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে এই সব রাজ্যের উপজাতি ও সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক মিশ্র সংস্কৃতি। প্রথম দিকে এই সব শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেত।' কিন্তু কালক্রমে এরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা থানার বড় শৌলমারী এবং জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমার কলাবাড়িয়া ও শামসিং এমন তিনটি গ্রাম যেখানে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষিকর্ম ও চা-বাগিচার কাজে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করার ফলে একাধিক প্রাদেশিক সংস্কৃতির মিশ্রণ ও রূপান্তর ঘটেছে। এর ফলে এতদঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস, সঙ্গীত ও শিল্পকলা, পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, পূজাপার্বণ, শিকার পদ্ধতি প্রভৃতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতির আলোচনায় যেমন দূর অতীতকে স্থান দিতে হবে, তেমনি নিকট অতীত এবং বর্তমান সংস্কৃতির পরিবর্তন বা রূপান্তরের কারণ

অনুসন্ধান করে ঐতিহাসিকবিষয়, নীতিধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আলোকপাত করতে হবে।

সমগ্র ডুয়ার্সকে দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত করে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ডুয়ার্সকে পশ্চিমদুয়ার নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে। একই ভাবে অধুনা আসাম প্রদেশের অন্তর্গত ডুয়ার্সকে পূর্ব দুয়ার নামে অভিহিত করা যায়। পশ্চিমদুয়ারের অধিবাসীদের মধ্যে প্রধান হল রাজবংশী সম্প্রদায়। এ ছাড়া আছে মেচ, রাভা, কার্যী, গিরি, ভর, খাঁড়াধরা যুগী এবং কয়েকঘর টোটো উপজাতি। টোটো এবং পলিয়াদের প্রভাব এতদঞ্চলের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে খুব বেশী নয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ই আলোচ্য অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রধান ধারক। 'খাঁড়া ধরা' ও কার্যী প্রকৃতপক্ষে রাজবংশী জাতির দুটি উপাধি। কুচবিহার রাজন্যবর্গ এই দুটি পদবীর স্রষ্টা। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় তিরিশ বছর আগেও কুচবিহার রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে বলির ব্যবস্থা ছিল। শক্তসমর্থ রাজবংশী পুরুষকে রাজবাড়ীর পূজাঅর্চনার বলিদানের কাজে নিযুক্ত করা হত। বছরের পর বছর যারা পূজার এই দায়িত্ব পালন করে আসতেন, তাদের খাঁড়া ধরা পদবীতে ভূষিত করা হয়েছিল। কার্যী পদবীও কুচবিহার রাজন্যবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত। এঁরাও প্রকৃতপক্ষে রাজবংশী। কুচবিহার রাজবংশের সঙ্গে এঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর এঁরা কার্যী উপাধি লাভ করে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানায় ভর উপাধিধারী এক শ্রেণীর লোকেরবাস রয়েছে। এঁদের পূর্বপুরুষ বিহার প্রদেশে বসবাস করতেন। পঁচিশ বছর আগে এঁদের বৃত্তি ছিল পালকীবহন। ভারবাহী ছিল বলেই এঁদের উপাধি 'ভর' হওয়া বিচিত্র নয়।

পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের জমির উৎকর্ষ সর্বত্র সমান নয়। কোনো জমির উৎপাদিকা শক্তি বেশী, আবার কোনোটি উৎকর্ষের বিচারে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' শাসনকালে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ডের 'রিপোর্ট' থেকে জানা যায় যে 'বত্রিশ হাজারী' তালুকদার বা বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারের বৈকুণ্ঠপুর তালুকটি কৃষিকার্যের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী ছিল।[৫] কিন্তু শুধুমাত্র প্রাচীন বৈকুণ্ঠপুর বা আধুনিক জলপাইগুড়ি জেলার জমি উর্বর ছিল এমন নয়, কুচবিহার জেলার কোনো কোনো অংশের জমিও অত্যন্ত উর্বর। এই সব জমিতে ধান ও অন্যান্য রবিশস্য ছাড়াও তামাক ও পাট প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য অনুসারে আলোচ্য অঞ্চলের জমিকে প্রধান ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :—

(১) দহলা

(২) সহরী বা মহরী

(৩) ডাঙ্গা

73956
28 MAR 1981

[illegible] জমিকে বলা হয় দহলা জমি। সামান্য বারিপাতের ফলে এই ধরণের জমিতে জল

জমে যায় । এই জমির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে জমির ফসল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় । তবে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হলে দহলা জমিতে ফসল ভাল হয় ।

সহরী জমি বেশি উঁচুও নয়, আবার খুব নীচুও নয় । চাষের পক্ষে এই ধরণের নাতি নিম্নোচ্চ জমি এ অঞ্চলের সর্বোৎকৃষ্ট । অধিক বৃষ্টিপাত অথবা সূর্যতাপে দহলা এবং ডাঙ্গা জমি যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সহরী জমি তখন কৃষকের ফসল উৎপাদনের একমাত্র সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় । এই ধরণের জমিতে বছরের সব সময় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যায় ।

সর্বাপেক্ষা উঁচু জমিকে বলা হয় ডাঙ্গা জমি । প্রচুর বৃষ্টিপাত না হলে ডাঙ্গা জমিতে ফসল ভাল হয় না । অত্যধিক সূর্যতাপ এই জমিতে ফসল উৎপাদনের অন্তরায় । কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ~~তথা~~ অঞ্চল এবং গোয়ালপাড়া ও রংপুর জেলায় এই তিন শ্রেণীর জমিতে ফসল উৎপন্ন হয় । জমির গুণাগুণ অনুসারে আলোচ্য অঞ্চলের কৃষকেরা তাঁদের কায়িক পরিশ্রম নিয়োগ করেন । প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত দহলা জমিতে আশাতীত ফসল উৎপন্ন করা যায় । আবার ডাঙ্গা জমিতে প্রচণ্ড পরিশ্রমের পরেও ভাল ফসল পাওয়া যায় না ।

:: ২ ::

রামায়ণ মহাভারতের যুগে বিশাল ভারত ভূখণ্ডের প্রাচ্যে মিথিলা এবং কৌশিকী কচ্ছের পূর্বদিকে যে জনপদ ছিল তার নাম পৌণ্ড্রদেশ । এর অবস্থান ছিল প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের উত্তরে হিমালয় এবং তার পাদদেশে নেপাল ও পূর্বপ্রান্তে দিক্ষু নদী, পশ্চিমে পুণ্যতোয়া করতোয়া এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষারমিলন স্থান ।

কিন্তু পৌণ্ড্রবর্ধন বা প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের প্রাকৃতিক সীমানা চিরদিন একরকম থাকেনি । নদীর গতিপথের পরিবর্তন, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে এই দুই রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে । প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন বা বর্তমান উত্তরবঙ্গকে পশ্চিমবাংলার উত্তরপ্রান্ত, উত্তরাঞ্চল, উত্তরখণ্ড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে । বর্তমান উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত বিশেষ কয়েকটি জেলার মধ্যে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলকে একত্রিত করলে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড পাই । এই ভূখণ্ডের নাম 'পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চল'।

জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক স্থানে কতগুলি বিশুষ্ক খাত দেখতে পাওয়া যায় । আমাদের মনে হয় এগুলি করতোয়া নদীর খাত । অবশ্য তিস্তা ও অন্যান্য নদীর খাত ও কিছু কিছু রয়েছে । ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের মতে, " গঙ্গার তিনগুণ চওড়া তিস্তা

করতোয়া শুকিয়ে গেল। মাঝে উঠল বিরাট চর। করতোয়া ও সাউ নামে দুটি ধারা বেঁচে থাকলো।[৬]

যে ভাবে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ বিগত অষ্টম শতকের শেষ দিকে পরিবর্তিত হয়েছে, ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীনের সেনাপতি ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিল্‌জী বিহার জয় করে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করেন পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে তাঁর আধিপত্য বিস্তার কালে করতোয়া নদীর বিস্তৃতি তিনগুণ ছিল।

পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে আমরা মোট পাঁচটি যুগে ভাগ করব। যথা :—

(১) প্রাক্‌পৌরাণিক বা অতি প্রাচীন যুগ।

(২) পৌরাণিক বা প্রাচীন যুগ।

(৩) পুরাণ-পরবর্তী যুগ বা মধ্যযুগ।

(৪) নব্য যুগ বা আধুনিক যুগ।

(৫) অতি-আধুনিক যুগ।

অতি-প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপাদান আজ আর নেই বললেই চলে। সুতরাং উক্ত-যুগ সম্বন্ধে বস্তুভিত্তিক প্রমাণ সাপেক্ষে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত বা মন্তব্যে আমরা উপনীত হতে পারব না। পৌরাণিক যুগে আলোচ্যাঞ্চল-এর অন্তর্গত জেলাগুলির স্বতন্ত্র নাম ছিল। মহাভারত ও বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে গোটা উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন নামের সন্ধান মেলে। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর দিনাজপুর জেলার দেবকোট থেকে তিব্বত অভিযানের সময়টাকে আমরা মধ্যযুগের সমাপ্তি বলে ধরে নিতে পারি। অরপরবর্তী যুগ মুসলিম ও ইংরাজ অধিকারের যুগ বা নব্যযুগ। স্বাধীনতালাভের পরবর্তী বছরকে অতি আধুনিক যুগের সূচনাকাল হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতির আলোচনায় অগ্রসর হব।

স্কন্দপুরাণ ও শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখিত 'সদানীর' (বর্তমান করতোয়া) ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের পশ্চিম সীমানা। এখানেই পনি জাতির সঙ্গে কোশলরাজ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।[৭]

বাগমতীর তীরেই (ব্লকম্যানের মতে এটি করতোয়া) ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন তিব্বত জয়ের উদ্দেশ্যে অবর্ধন শহরে এসে পৌঁছেছিলেন।[৮]

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' পক্ষথেকে বৈকুণ্ঠপুরে (জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাসগত নাম) অভিযান চালিয়েছিলেন। সে সময়েও তিস্তা ও অন্যান্য পাহাড়িয়া নদনদী তাদের শাখা ও উপনদী নিয়ে এতদঞ্চলে প্রবাহিত হত।[৯]

প্রাচীন ও নব্যযুগের উপরোক্ত ঘটনা সৃষ্টিতে ভৌগোলিক পরিবেশ যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এর সঙ্গেই ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে লোকসমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস।

:: ৩ ::

রাজপুতনার উষর মরুভূমির প্রচন্ড দাবদাহ বা চেরাপুঞ্জির মত প্রবল বর্ষণ স্রোত পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের জনজীবনকে অস্থির করে তোলে নি। আকস্মিক বন্যা হয়ত স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করেছে[১০]। কিন্তু তা কোনো কালেই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। সেই জন্যেই পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত উত্তরপূর্বাঞ্চল ও বারোমাসে তের পার্বণের আনন্দে মেতে ওঠে। এতদঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়ে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান দেবমহিমায় উন্নীত হয়ে ভক্ত বৃন্দের বিনম্র চিত্তের পূজা উপহার গ্রহণ করে চলেছে। নদী, গাছ, পাথর, মাটির ঢেলা পবিত্র বেদীতে আসীন হয়ে আঞ্চলিক জনগণের ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধারপাত্র হয়ে উঠেছে। ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে বসন্তকালীন পূজা উৎসবে বারবার পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের জনমানসে আনন্দের ফল্গুস্রোত প্রবাহিত হয়। আবার বর্ষাসমাগমে ধনীদরিদ্র উভয়েই গারাম ঠাকুর বা গারাম রসীর পূজায় মেতে ওঠে। আষাঢ়ি অনুষ্ঠানে রাস্তার দুপাশে ছোটশিশুরা মাটির বেদী নির্মাণ করে পথিকের কাছে ফলমূল বা পয়সা 'মাগন' নেয়। শরৎকালে শারদীয়া পূজার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অপ্রধান দেবদেবীর পূজা ও এ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৃতির কোলে আজন্ম লালিত পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগণ তার ভীষণ ও মধুর — উভয় রূপের সঙ্গেই পরিচিত। যে ভৌগোলিক পরিবেশকে আশ্রয় করে তারা শৈশব থেকে যৌবনের মধ্য দিয়ে বার্ধক্যের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়, সেই পরিবেশের মায়া তাঁরা কাটাতে পারে না। তাই ভয়ংকরী তিস্তা, মেচী, রায়ডাক, জলঢাকা ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তাল জলস্রোতে জনজীবন বিপর্যস্ত হলে, কিংবা অশনি সম্পাৎ ও মেঘমেদুর অম্বর আতঙ্কের সৃষ্টি করলেও গ্রামবাসীর মন গ্রাম ছেড়ে যেতে চায় না। কারণ ভৌগোলিক পরিবেশ শৈশবকাল থেকেই ব্যক্তির মানস গঠনের সহায়ক হয়েছে।

ভৌগোলিক পরিবেশ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণা বা দৈবী ভাবনাতেই সীমিত থাকে নি। এতদঞ্চলের গৃহনির্মাণ পদ্ধতিও ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

যেখানে বৃষ্টিপাতের প্রচন্ডতা, সেখানকার ঘরবাড়ী বৃষ্টিপাতের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাংশের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি ও গৃহের সংখ্যা নির্ভর করে গৃহকর্তার মাসিক বা বার্ষিক আয়ের উপর। দরিদ্র কৃষক বা

ভাগচাষী একটি বা দুটি ঘর নির্মাণ করে। একটি বিশ্রামের ঘর বা 'থাকা ঘর' এবং অন্যটি 'চুলাঘর' বা রান্নাঘর। অধিকাংশ ঘরই দোচালা। যে সবস্থানে বার্ষিক বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ গড়ে ১৫০"-এর বেশী সেখানকার ঘরের ভিটা সাধারণত: জলস্রোতের থেকে রক্ষা পাবার জন্য উঁচু হয়। দুই গৃহের মাঝখানে থাকে একফালি উঠান বা 'আংনা'। ঘরের মেঝে প্রত্যহ গোবর ও মাটি দিয়ে নিকানো হয়। চারপাশে বাঁশের অথবা পাট-কাঠির বেড়া দেওয়া হয়; 'থাকা ঘরে' অনেকে একটি বারান্দাও তৈরী করেন। অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা তিনটি চারটি অথবা তারও অধিক গৃহনির্মাণ করেন। রান্নাঘর এবং শোবার ঘর ছাড়াও খলাভাজি ঘর, রন্দারী ঘর, ডারি ঘর, কালিঘর প্রভৃতি কয়েকটি ছোট বড় ঘর একটি পরিবারের সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতার সাক্ষী বহন করে।

বর্ষার আগেই প্রতিটি খড়ের ঘরের 'টুই' বা চালার উপরের অংশ নতুন খড় দিয়ে ছাওয়া হয়। 'দুন' বা ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দুবছর পর পর বাঁশের খুঁটি পালটানো হয়। এই নবীকরণের মূলে রয়েছে আলোচ্য অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব। প্রাকৃতিক ভৌগোলিক পরিবেশের গুণের দ্বারা আজকের সভ্যজগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভেদে মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান আহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। প্রাকৃতিক ভৌগোলিক পরিবেশের গুণে কৃষিতে কৃষি প্রধান দেশে অরণ্যপশুর কবল থেকে শস্য ও প্রাণ রক্ষার নানাবিধ উপায় চিন্তা করতে হয়। এই ভাবে সৃষ্টি হয় শিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি ও পশু বশ করার মন্ত্র।

ধর্ম ও সাহিত্যকে বাদ দিলে যেমন সংস্কৃতির আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ঠিক তেমনি ভৌগোলিক পরিবেশের উল্লেখ না করলে লোকসংস্কৃতির পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয় না। তাই আগে ভৌগোলিক পরিবেশ; তারপরে সেই পরিবেশে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। ভৌগোলিক পরিবেশকে যেন এক উর্বরা ক্ষেত্র এবং লোকসমাজ সেই সেই ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত এক ক্রমবর্ধমান বৃক্ষবিশেষ। লোকসংস্কৃতি সেই বৃক্ষেরই ফল।

*****

গ্রন্থপঞ্জী :

১। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা :'কথা প্রসঙ্গে' (১ম খন্ড)- সুকুমার সিংহ ।

২। "Booming sound of Tista and Torsa, Jaldhaka, Karatoa, Duduya, Mujnai, Kaljani, Raidak, Sankosh ". -"Memoirs of a Map of Hindusthan" - Major Rennel. (Page at 352) (পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লেখিত)

৩। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৬৯-১৯৬৮) : পৃ: ৩৪৫ ।

৪। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৬৯-১৯৬৮) - পৃষ্ঠা ২১৩।

৫।"The Bycunpore is in a very high state of cultivation and appears to be one of the richest I have beheld." - District Hand Book (Jalpaiguri) Page No. 7

৬। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ : পৃষ্ঠা ৩৫৪ ।

৭-৮। ঐ ঐ পৃষ্ঠা ৩৪৮, ৩৪৯ ।

৯। District Hand Book - (Jalpaiguri) Page No. 7

১০। ১৭৮৭, ১৯৫০, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬৮, সালের বন্যা স্মরণীয় ।

******